বিভিন্ন সংস্করণে ‘ফিরে এসো, চাকা’

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের চিনে নিতে আগাগোড়াই যথেষ্ট দেরি করেছে। তথাপি, বিনয় মজুমদারের ক্ষেত্রেও এই ঐতিহ্যেরই অনুসরণ দেখে ক্ষুব্ধ হই, বিচলিত হই, ভেতরে-ভেতরে লজ্জিত ও পীড়িত বোধ করি। বাংলা কবিতার আকাশে দু-দুটি সূর্য জ্বলেছেন বিনয় : ‘ফিরে এসো, চাকা’ এবং ‘অম্লানের অনুভূতিমালা’। তবু নগণ্য কিছু কবিতা-প্রাণ পাঠক ব্যতীত ব্যাপক পাঠক-সমাজে বিনয় আজও অপরিচিত, অজ্ঞাত। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত বা কবিতা-টবিতা পড়েন বলে দাবি করেন এমন মানুষজনের কাছেও যখন বিনয় মজুমদার অপরিচিত থাকেন, বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি বা সমালোচকও যখন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিষয়ক আলোচনায় বিনয় মজুমদারের নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন না, তখন লজ্জিত ও বিচলিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে কি ? সাহিত্য নিয়ে আমাদের এত উচ্ছ্বাস, হই-চই ; চারিদিকে এত পত্র-পত্রিকা এ-সবের মধ্যে কি বড় কোনো ফাঁকি বাসা বেঁধেছে ? নিজের ও বন্ধু-বান্ধবের লেখা সংগ্রহ করে পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য আমাদের যে উৎসাহ, তার কতটুকু আমরা ব্যয় করি আমাদের সময়ের মূল্যবান লেখাপত্র সম্পর্কে আমাদের মতামত জানানোর জন্য ? পুরনো বা অতিপুরনো বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নগুলি পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা স্মৃতিভ্রষ্ট। আত্মকেন্দ্রিক ও বন্ধুকেন্দ্রিক আমরা এ কোথায় চলেছি ?

তথাকথিত সাহিত্য সমালোচকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীন সাহিত্যের আস্বাদগ্রহণে সক্ষম নন। সৃষ্টিশীল ও চক্ষুষ্মান সাহিত্যিক সাহিত্যের নতুন যে ভূষণগুলি আবিষ্কার করে চলেছেন, সেগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভার এঁদের ওপর ফেলে রাখাটা কোনো কাজের কথা নয়। এই দায়িত্ব নিতে হবে তাঁদেরই যাঁরা সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, নচেৎ আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পাঠকসমাজের কাছে অপরিচিতই থেকে যাবে।

বিনয় মজুমদারের মতো বড়ো মাপের কবি পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতেই খুব বেশি নেই এবং এত বড়োমাপের আর একজন কবির আবির্ভাবের জন্য বাংলা সাহিত্যকে নিশ্চিত-ভাবেই দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। অথচ বিনয় মজুমদার ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমরা জানি কত কম ! বিনয়কে যাঁরা জানেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছেও বিনয় প্রায় কিংবদন্তীর পুরুষ। তাঁকে নিয়ে নানা জনশ্রুতি তাঁর ছোট পাঠকমহলেও দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। এর কারণ, তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল এবং গভীর এক দার্শনিক অন্বেষণে আহত, ক্ষতবিক্ষত এই কবি তাঁর গ্রামে নিজেকে প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসিত রেখেছেন। কিছু তরুণ কবি ছাড়া তাঁর খোঁজ এখন বিশেষ কেউ আর নেন না।

১৯৯২ খৃস্টাব্দের, ১৭ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে আমরা নিঃশব্দে চলে যেতে দিয়েছি। বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য এই দিনটির কথা অধিকাংশ বাঙালি পাঠকই খেয়াল করেননি। বিনয় মজুমদার এই দিনেই তাঁর আটান্ন বছর বয়স পূর্ণ করেন এবং এই দিনেই 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম 'ফিরে এসো চাকা' নামে প্রকাশের তিরিশ বছর পূর্ণ হয়। এখনকার বাংলা কবিতার পাঠক অরুণা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'র সঙ্গেই পরিচিত। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটির একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস আছে। নিচে এই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। 'গায়ত্রীকে' পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে 'ফিরে এসো, চাকা' নামে প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করেন 'গ্রন্থজগৎ'-এর শ্রী দেবকুমার বসু, ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর। 'ফিরে এসো, চাকা' এরপর 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ৩১শে জুলাই প্রকাশিত 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে 'আমার ঈশ্বরীকে'র সমস্ত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়। 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে আবার 'ফিরে এসো, চাকা' নামে এই গ্রন্থের কলকাতা সংস্করণ প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করেন মীনাক্ষী দত্ত, ১লা মার্চ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দে। কলকাতা সংস্করণের পর 'ফিরে এসো, চাকা'র নাম আর পরিবর্তন করা হয়নি। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের, অগ্রহায়ণ মাসে 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই অরুণা সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ১৯৯০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে। নিচে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

গায়ত্রীকে

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম। এই তথ্য 'ফিরে এসো, চাকা'র বহু পাঠকেরই অজানা। বিনয় মজুমদার তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে 'গায়ত্রীকে' সম্বন্ধে লিখেছেন : 'অবশেষে সেই এক ফর্মা পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। নাম 'গায়ত্রীকে'। চোদ্দটি কবিতা ছিলো তাতে। মোট ষোলো পৃষ্ঠার বই। আগেই ভেবেছিলাম যে দ্বিতীয় সংস্করণে আরো অনেক কবিতা যুক্ত ক'রে পুস্তিকাখানিকে একখানি পূর্ণাঙ্গ বই ক'রে ফেলবো। ফলে আমি লিখে চললাম। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে একটি চাকরি পেয়ে আমি কোলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরে যাই। সেখানে তিন শিফটে কাজ করতে হতো। সকালের শিফট সন্ধ্যার শিফট এবং রাত্রের শিফট। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই তিন শিফটেই কাজ করতে হতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি কবিতা লিখতাম। মাস আড়াই কাজ করার পর আমি 'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাকে পরিবর্ধনের ব্যাপার শেষ ক'রে ফেলি। সাতাত্তরটি কবিতা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি আমি দেবকুমার বাবুকে দিয়ে গেলাম। বই এর নাম 'ফিরে এসো, চাকা'।'

'গায়ত্রীকে'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের পেছনের পৃষ্ঠা নিচে দেওয়া হল :

'প্রথম প্রকাশ : ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; মার্চ, ১৯৬১। প্রকাশক : দেবকুমার বসু, গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট্, কলকাতা-১২
মুদ্রাকর : নির্মল কৃষ্ণ পাল, নির্মল মুদ্রণ, ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট্ কলকাতা-৬
মূল্য—'৭৫ টাকা'

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র নেই।

লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের ১০-ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিনয় মজুমদারকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়। পুনর্মুদ্রণের তারিখ ৮ আষাঢ়, ১৩৯৫, ২৩ জুন, ১৯৮৮ এবং প্রকাশক : বুলবুল দত্ত, হার্দ্য, ১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

বুলবুল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে বিনয় মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বিনয়ের রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তবে, 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি যে 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম—এ-তথ্যের উল্লেখ এখানে করা হয়নি। তাছাড়া 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের একটি মুদ্রণপ্রমাদ এই পুনর্নমুদ্রণে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থেকে গেছে। মুদ্রণপ্রমাদটি হল : 'খরগোশগুলি সব **ধূসরঙ** রোম ত্যাগ ক'রে' (গায়ত্রীকে'র নবম কবিতার চতুর্থ পংক্তি)। এই পংক্তিটির প্রকৃত পাঠ হবে : 'খরগোশগুলি সব **ধূসরাভ** রোম ত্যাগ ক'রে'।

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করে বুলবুল দত্ত বাঙালি কবিতা পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'গায়ত্রীকে'র খুব উল্লেখযোগ্য একটি সমালোচনা লেখেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্প্রতি' পত্রিকায়। এই বিষয়ে বিনয় মজুমদার তাঁর লেখা 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলো শক্তি। লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বস্তু নিয়ে সার্থক কবিতা লিখতে পারি।...শক্তির এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত কোনো পত্রিকাতে আমার কবিতা কেউ চেয়ে নিতো না। সম্পাদকেরা চাইতো না এবং আমিও দিতাম না। ফলে এখন যদি কেউ আমার লেখার সন্ধানে পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটেন তবে হতাশ হবেন। কবিতার জগতে আমার প্রবেশ পত্রিকায় কবিতা ছেপে নয়, বই ছেপে।'

'গায়ত্রীকে'র কয়েকটি কবিতা 'ফিরে এসো চাকা'য় সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে, কিছু কবিতা গ্রহণ করা হয়েছে পরিমার্জনার পরে, কিছু কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে। বই দুটি পড়লেই এসব জানা যাবে। এই গ্রহণ ও পরিমার্জনার বিষয়টি, তথাপি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। এই আলোচনাটি বোঝার জন্য 'ফিরে এসো, চাকা'র সাতাত্তরটি কবিতাকে ১, ২, ৩...এইভাবে চিহ্নিত করে নিতে হবে। 'ফিরে এসো, চাকা' বলতে এখানে আমি অরুণা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'কে বোঝাতে চাইছি।

'গায়ত্রীকে' ও 'ফিরে এসো, চাকা' (অরুণা প্রকাশনীর) অন্তর্ভুক্ত একই কবিতার পাঠভেদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের একটি তালিকা :

'গায়ত্রীকে'র প্রথম কবিতাটিই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম কবিতা, পরিবর্তন করা হয়েছে কেবল ১৩ নম্বর পংক্তিতে। 'ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করে' পংক্তিটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় হয়েছে 'দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে'। স্তবকবিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র দ্বিতীয় কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় কোনো পরিমার্জনা ছাড়াই গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রেও স্তবকবিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র তৃতীয় কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩ নম্বর কবিতা, কেবল প্রথম দুটি লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় লাইনের শুরুতে 'শিশুকালে' শব্দটি যোগ করা হয়েছে ও ১৩ নম্বর লাইনের 'হায়রে' শব্দটি বদলে করা হয়েছে 'অথচ'। 'গায়ত্রীকে'র মতো 'ফিরে এসো, চাকা'য় কবিতাটিকে স্তবকে বিন্যস্ত করা হয়নি।

'গায়ত্রীকে'র চতুর্থ কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৭ নম্বর কবিতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্তবকবিন্যাসে পরিবর্তন করা হয়েছে।

'গায়ত্রীকে'র পঞ্চম কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৬ নম্বর কবিতা। 'গায়ত্রীকে'র মতো এক্ষেত্রে কবিতাটিকে স্তবকে বিন্যস্ত করা হয়নি। এই কবিতাটির ৭ ও ৮ নম্বর লাইন দুটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় বর্জন করা হয়েছে। এবং ৯ নম্বর লাইনে 'অতিস্থূল অর্থহীন' পালটে 'অর্থহীন অতি স্থূল' করা হয়েছে।

'গায়ত্রীকে'র সপ্তম কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ২৫ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র নবম কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৮ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র একাদশতম কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৯ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র দ্বাদশতম কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে 'ফিরে এসে, চাকা'র ২৩ নম্বর কবিতার মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র ত্রয়োদশতম কবিতার সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ২২ নম্বর কবিতার প্রচুর মিল রয়েছে।

'গায়ত্রীকে'র চতুর্দশতম কবিতার ৭ ও ৮ নম্বর লাইন দুটি 'ফিরে এসো, চাকা'র অবিস্মরণীয় 'অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতায়' কবিতাটির বীজ।

'গায়ত্রীকে'র ৬, ৮ ও ১০ সংখ্যক কবিতাগুলি 'ফিরে এসো, চাকা'য় বর্জন করা হয়েছে।

'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাটির নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার আমাকে লিখেছেন : 'গায়ত্রী

চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। এবং ১৯৬০ কি ১৯৬১ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথমা হয়ে পাস করেছিলো। সেই আমার কবিতা বুঝতে পারবে ভেবে তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে 'গায়ত্রীকে' বইখানি লেখা। সেইহেতু বই-এর নাম 'গায়ত্রীকে' রেখেছিলাম।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, বিনয় মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'নক্ষত্রের আলোয়'। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন এবং প্রকাশ করেন 'গ্রন্থজগৎ' প্রকাশন সংস্থার দেবকুমার বসু। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'নক্ষত্রের আলোয়'কে বলা যায় 'একজন নবীন কবি যশোপ্রার্থীর আবেগতাড়িত সৎ ও অপটু রচনা।' জীবনানন্দের প্রভাব এই কাব্যগ্রন্থটির আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'ও বেশ দুর্বল রচনা, তবু 'ঝরাপালক'এর কোনো কোনো কবিতায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্যগ্রন্থে 'ফিরে এসো, চাকা'র কবির সামান্যতম পূর্বাভাসও নেই।

গায়ত্রীকে' এবং 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থ দুটির কবিতা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বিনয় তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে 'পয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করা দরকার, পয়ার কোনো ছন্দের নাম নয়, আট+ছয় মাত্রার চালের ছন্দকেই পয়ার বলা হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ছন্দসরস্বতী' গ্রন্থে লিখেছেন : 'আটছয় আটছয় পয়ারের ছাঁদ কয়'। পয়ার অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত এই তিন ছন্দেই হওয়া সম্ভব। যাই হোক, বিনয় এই প্রসঙ্গে তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ভুল পয়ার আমি একবারও লিখতে পারতাম না। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটি স্পষ্ট টের পেতাম। কিন্তু সে ভুল শোধরাবার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না। তখন থেকে শুরু ক'রে চারবছর আমার লেগেছিলো পয়ার লেখা শিখতে—আবিষ্কার করতে লেখাটাই ঠিক ছিলো মনে হচ্ছে। এবং ১৯৬০ সালের শুরুতে আমি পয়ার লেখার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কার করি। তারপর পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দ লিখিই নি। এখন পয়ারই আমার প্রিয়তম ছন্দ। শুধু পয়ারই লিখি।'

প্রকাশিত হবার পর 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্যগ্রন্থটি চেনাজানা অনেককেই পড়তে দিয়েছিলেন বিনয় মজুমদার। কিন্তু এই গ্রন্থটি নিয়ে কেউই কোনো আলোচনা করেননি। 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্যগ্রন্থের ব্যর্থতাই বিনয়কে নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে কবিতা লিখতে প্ররোচিত করেছিল। ফলে আমরা পেয়েছি 'গায়ত্রীকে'র মতন একটি কাব্যগ্রন্থ। 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের কয়েকটি পাতার মধ্যেই মহৎ একজন কবির পূর্বাভাস অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রই টের পাবেন। কী গভীর ভাবনাচিন্তা এবং পরিশ্রম 'নক্ষত্রের আলোয়' গ্রন্থের কবিকে 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের কবিতে পরিণত করেছিল তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

ফিরে এসো, চাকা : দ্বিতীয় সংস্করণ : গ্রন্থজগৎ সংস্করণ

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের কিছু কবিতা গ্রহণ করে, কিছু কবিতার সংস্কার করে, কিছু

কবিতা বর্জন করে এবং বহু নতুন কবিতা যোগ করে 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশিত হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খৃস্টাব্দে; বিনয় মজুমদারের ২৮তম জন্মদিনে (বিনয় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর)। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন 'গ্রন্থজগৎ' প্রকাশন সংস্থার দেবকুমার বসু। এই প্রবন্ধে দেবকুমার বসুর 'গ্রন্থজগৎ' থেকে প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'কে আমরা 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণ নামে উল্লেখ করব। 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হল :

আখ্যাপত্র

'ফিরে এসো, চাকা / বিনয় মজুমদার / গ্রন্থজগৎ-কলকাতা ১২'

আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা

'প্রথম প্রকাশ : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ / ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৯ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু / গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, / কলকাতা-১২ / প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় / মুদ্রক : শ্রীনির্মল কৃষ্ণ কাঞ্জিলাল / ৮-ব্রজদুলাল স্ট্রিট, / কলকাতা-৬ / দুই টাকা'।

'ফিরে এসো, চাকা'র এই সংস্করণে কবিতার সংখ্যা সাতাত্তর।

গ্রন্থজগৎ সংস্করণে 'ফিরে এসো, চাকা' যে 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ—এ কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণে প্রচুর ছাপার ভুল ছিল। এই প্রসঙ্গে বিনয় তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'এরপরই বেরোলো 'ফিরে এসো, চাকা'। তখন আমি দুর্গাপুরের চাকরি ছেড়ে কোলকাতায় ফিরে এসেছি। 'ফিরে এসো, চাকা' কোলকাতায় ফেরার আগেই ছাপা হয়ে গেছলো। ফলে আমি প্রুফ দেখতে পারিনি। অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেসলো। যেমন 'শুভ্রগান' এর জায়গায় ছাপা হয় 'শুভগান'। অনেক জায়গায় শব্দও বাদ চ'লে গেসলো। আর কবিতার শব্দ বাদ যাওয়া মানেই তো ছন্দ পতন।'

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থেই বিনয় তাঁর নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করতে তৎপর হয়েছিলেন, এই গ্রন্থে আমরা দেখা পেয়েছি একজন সম্ভাবনাময় কবির। 'ফিরে এসো, চাকা'য় আমরা পেলাম পরিপূর্ণ একজন কবিকে। জীবনানন্দের কবিতা রচনার রীতিকে আত্মস্থ করে বিনয় খুঁজে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভাষা ও নিজস্ব জগৎ। 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থের ভীতিপ্রদ গভীরতা ও বহুমাত্রিক ইঙ্গিত বাংলা কবিতায় নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে।

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে : শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তীকে। 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী সম্বন্ধে বিনয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'কবিতীর্থ' পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৮৬ সংখ্যায় 'কোনো গোপনতা নেই' শিরোনামে সমর

তালুকদারের নেওয়া বিনয় মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হল :

'জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল—

গায়ত্রীকে কি তুমি ভালো বাসতে ?

—আরে ধ্যুৎ, আমার সঙ্গে তিনচারদিনের আলাপ—প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা সুন্দরী ছাত্রী ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের—তারপরে কোথায় চলে গেলেন—আমেরিকা না কোথায়—ঠিক জানি না।

—তাহলে ওকে নিয়ে কবিতা কেন ?

—কাউকে নিয়ে তো লিখতে হয়—আমগাছ, কাঁটাগাছ, রজনীগন্ধা নিয়ে কি চিরদিন লেখা যায় ?'

এই প্রসঙ্গে বলি, অনেকেরই ধারণা 'ফিরো এসো, চাকা'র কবিতাবলী গায়ত্রী চক্রবর্তীকে নিয়ে লেখা কবিতার সংকলন মাত্র। বিনয় নিজেও কোনো কোনো জায়গায় এই কথা সমর্থন করেছেন। বাহ্যত, 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতা নিশ্চিতভাবেই প্রেমের কবিতা, ব্যর্থ প্রেমের কবিতা। কিন্তু সচেতন এবং বিপদজনক এক দার্শনিক অন্বেষণে আহত, রক্তাক্ত এক কবির পদচিহ্ন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। 'ফিরে এসো, চাকা'র দার্শনিক অন্বেষণের কথা বিনয় নিজেই লিখেছেন তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে : 'সৃষ্টির মূলে যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সার সত্য সব্বল ক'রে ভেবে দেখলাম, জড়ের জীবনে যা সত্য মানুষের জীবনেও তাই সত্য, উদ্ভিদের জীবনে যা সত্য মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। এইভাবে শুরু হল কবিতার জগতে আমার পদযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হল 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা'।'

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার আমাকে জানিয়েছেন : 'আমার এক বন্ধু ছিল, নাম সরোজ চক্রবর্তী। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুরে আমার সঙ্গে পড়ত। একবছর পড়ার পর ইংল্যান্ডে চ'লে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কিন্তু সেখানে পড়া শেষ না ক'রেই বাড়ি ফিরে আসে বছর দুই ইংল্যান্ডে থেকে। সরোজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস সি. পাশ। সুতরাং দেশে ফিরে 'মেটাল বক্স' কোম্পানিতে চাকরি পায়। চৌরঙ্গী রোডে 'মেটাল বকস' কোম্পানির অপিসে গিয়ে দেখি সরোজের দরজায় লেখা : 'সরোজ চাক'। 'চাক' এর স্ত্রীলিঙ্গ 'চাকা'। গায়ত্রী চক্রবর্তীকেই আমি গায়ত্রী 'চাকা', বানিয়েছি। 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটির নামকরণের ইতিহাস এই।'

বলাই বাহুল্য, 'ফিরে এসো, চাকা'র 'চাকা' আসলে গতির প্রতীক। গতিহীন কবি তাঁর লুপ্তগতি পুনরুদ্ধারের জন্য হাহাকার করেছেন : 'আমি মূঢ়, উড়ে গেছো ; ফিরে

এসো, ফিরে এসো চাকা,'। তবু, 'ফিরে এসো, চাকা' নামকরণের এই ইতিবৃত্তে আমরা যথেষ্ট কৌতুক বোধ করি।

'ফিরে এসো, চাকা'র তৃতীয় সংস্করণ : আমার ঈশ্বরীকে

'ফিরে এসো, চাকা'র তৃতীয় সংস্করণ 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয়। নিচে 'আমার ঈশ্বরীকে'র আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল, এখান থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে :

'কপি রাইট : মীনাক্ষী দত্ত / ৪০।১-এ বুড স্ট্রিট্, / কলকাতা-১৯ / প্রথম সংস্করণের নাম : গায়ত্রীকে / প্রকাশের তারিখ : ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। / দ্বিতীয় সংস্করণের নাম : ফিরে এসো, চাকা / প্রকাশের তারিখ : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ / ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ / বর্তমান তৃতীয় সংস্করণের নাম : আমার ঈশ্বরীকে / প্রকাশের তারিখ : ১৩ই জুন, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ / প্রকাশক : বিনয় মজুমদার / ব্যক্তিগত প্রকাশনী / কলকাতা-১২ / মুদ্রক : বিভাস গুহঠাকুরতা, / ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস / ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, / কলকাতা-৯ / প্রচ্ছদ লিপি : বিনয় মজুমদার / মূল্য : ৩·৩৩ টাকা'

বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে : 'আমার ঈশ্বরীকে'।

পাঠকের কাছে 'ফিরে এসো, চাকা'র 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত সংস্করণটি তিনটি কারণের জন্য উল্লেখযোগ্য। কারণগুলি হল : ১. এই গ্রন্থে 'প্রারম্ভিক' শিরোনামে একটি অনবদ্য ভূমিকা আছে। যা 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই ভূমিকাটিকে বর্জন করা হয়েছে। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে (এই প্রবন্ধের অন্যত্র এই গ্রন্থটিকে নিয়ে আলোচনা করা হবে।) এই ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে দু-একটি লাইন বাদ দিয়ে। নিচে কিছু মন্তব্যসহ এই ভূমিকাটি দেওয়া হয়েছে।

২. এই গ্রন্থে ৬টি নতুন কবিতা আছে যা 'ফিরে এসো, চাকা'র অন্য কোনো সংস্করণে নেই। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র 'আমার ঈশ্বরীকে' অংশে অবশ্য এই ৬-টি কবিতাই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। একটু নিচে এই প্রবন্ধের পাঠককে আমি এই ৬-টি কবিতাই উপহার দিয়েছি।

৩. এই গ্রন্থে বিনয় মজুমদার নানা কবিতায় অল্পবিস্তর পরিমার্জনা করেছেন। এই প্রবন্ধের অন্যত্র এই পরিমার্জনার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা ৭৯টি। 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের ৭৭টি কবিতার ভিতর ৭৩টি কবিতা 'আমার ঈশ্বরীকে'তে গৃহীত করা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে এই চারটি কবিতা : ১. স্বপ্নের আধার তুমি ভেবে দ্যাখো, অবিকৃত দু-জন যমজ (৩৮ সংখ্যক কবিতা), ২. চিৎকার আহ্বান নয়, গান গেয়ে ঘুম ভাঙালেও (৭২ সংখ্যক কবিতা), ৩. করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ

ফোটেন (৭৪-সংখ্যক কবিতা) এবং ৪. আঘাত দেবে তো দাও, আর নেই মৃত স্মৃতি-রাশি (৭৬-সংখ্যক কবিতা)।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের ভূমিকা

॥ প্রারম্ভিক ॥

একজন বান্ধবকেন্দ্রিক এই শুদ্ধমাত্র প্রেমার্তির কাব্যখানি যথাযথ দিনপঞ্জি বিশেষ। তবে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রচনা করার ফলে কাব্যের অন্তর্গত সংখ্যাত প্রতিটি অংশ যে কোনো পাঠক কিংবা পাঠিকার নিজেরই জীবনের কোনো পরিস্থিতির বিশিষ্ট রূপায়ণ ব'লে মনে হবার কথা। সেই উদ্দেশ্য মনে রেখেই প্রতিটি সংখ্যাত অংশ রচনা করা হয়েছে।

আবার যেহেতু যে কোনো একটি মাত্র অংশই প্রেম, সমাজনীতি, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে বিজড়িত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য সেহেতু যে কোনো পাঠক কিংবা পাঠিকার জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিরই সফল রূপায়ণ এ কাব্যে খুঁজে পাবার কথা। আমরা যে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্বপ্ন দেখি (দৃশ্যের পর দৃশ্যের সমন্বয়ে) সেই পদ্ধতিতে কাব্যখানি এবং কাব্যের অন্তর্গত প্রত্যেক সংখ্যাত অংশ রচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক সংখ্যাত অংশই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। এবং কালানুক্রমে দিনপঞ্জি রূপে লিখিত কবিতাবলী একযোগে একখানি পূর্ণ কাব্যও। অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যাত অংশই পৃথকভাবে হৃস্ব কবিতারূপে বিবেচিত অবস্থায় পাঠ করা সম্ভব।

এই সংকলনে সব সমেত ৭৯টি কবিতা আছে এবং কবিতার সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না। কাব্যের নামও আর পরিবর্তিত করা হবে না।

এই তৃতীয় সংস্করণই এই কাব্যের একমাত্র প্রামাণ্য সংস্করণ। স্থান সঙ্কুলান হলে ভবিষ্যতে মুদ্রণকালে বই-এর একপৃষ্ঠায় একটি ক'রে সংখ্যাত অংশ ছাপা যেতে পারে।

৫ই জুন, ১৯৬৪ বিনয় মজুমদার'

এই ভূমিকাটিতে বিনয় মজুমদার স্পষ্টতই 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলীর বহুমাত্রিকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলী এই বহুমাত্রিকতা অর্জন করেছে 'বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে' রচিত হওয়ার ফলেই। যদিও বিনয় এখানে ঘোষণা করেছেন যে 'কবিতার সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না। কাব্যের নামও আর পরিবর্তিত করা হবে না।' পরবর্তী সংস্করণে বিনয় কাব্যের নাম পরিবর্তিত ক'রে করেন 'ফিরে এসো, চাকা' এবং কবিতার সংখ্যাও কমিয়ে দেন। তাছাড়া, এই ভূমিকায় বিনয় 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণটিকেই 'এই কাব্যের একমাত্র প্রামাণ্য সংস্করণ' হিসেবে ঘোষণা করলেও 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণে 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠ বর্জন করে 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠকেই গ্রহণ করেন।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের ৭৯টি কবিতা ১, ২, ৩, ৪···৭৯ এইভাবে সংখ্যায়িত করে ছাপা হয়েছে।

'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণ থেকে ৬টি কবিতা

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে এমন ছটি কবিতা আছে যা 'ফিরে এসো, চাকা'য়, 'আমার ঈশ্বরীকে'র পরবর্তী কোনো সংস্করণে গ্রহণ করা হয়নি। নিচে এই কবিতাগুলি দেওয়া হল। রচনাগুলির নিচে রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে।

এই কবিতাগুলি কেন 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে গ্রহণ করা হয়নি—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বিনয় মজুমদার আমাকে জানিয়েছেন : '···মূল বই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণই মূল লেখা। এই কথাই আসল।···'ফিরে এসো, চাকা' বইটি পুরোটাই গায়ত্রী চক্রবর্তীকে আমার বক্তব্য। সুতরাং, এই বইয়ে পরে লেখা কবিতা যোগ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

উল্লেখ করা দরকার, এখানে "মূল বই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণ" বলতে গ্রন্থজগৎ সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র কথাই বলা হচ্ছে।

১

স্বপ্নের সুযোগে তুমি দিয়েছিলে সবকিছু—সব
সমাজ বন্ধের ঊর্ধ্বে তোমাকেই অনুভব ক'রে
প্রিয় বাষ্পময় রূপে নিজেকে করেছি অনুভব,
আবার বিশাল রৌদ্রে মনোলীনা হয়ে গেছো ভোরে।
এই যে মুহূর্ত, এই কাব্য, গীতি অমেয় তৃষ্ণায়
অমেয় আকাঙ্ক্ষা থেকে কতদিন কতকাল ব্যাপী
রচনা করেছি তা তো আমি জানি, স্বপ্নের নীলিমা।
উদ্দাম তড়িতাহত শিশির মধুও হয়ে যায়,
কুসুমের অভ্যন্তরে মধু হয়ে শান্ত হতে পারে।
সেহেতু নিদ্রার প্রতি শরীরের, হৃদয়ের আর
অন্যবিধ বিষয়ের, ব্যাপারের সুনিদ্রার প্রতি
এখনো শিথিল প্রীতি আমাদের হৃদয়ে রয়েছে।
এইভাবে যেন থাকে, যেন কোনো ভূগর্ভ যুগীয়
অন্ধকারও নিভে গেলে সুনিদ্রায় শূন্যায়িত হই।
১৯.১২.৬৩

২

এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ ডাকে,
ডাক দিয়ে যায় সব সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়, জীবন,
নির্ভুলতা, যুগ যুগ এইভাবে প্রিয় প্রার্থিতের
নির্বাচন হয়ে থাকে—স্বপ্ন এসে বলে দিয়ে যায়,

সুনির্দেশ দিয়ে যায়, আমাদের স্নিগ্ধ, স্থির করে।
করবী, করবী তুমি কালরাত্রে···রাত্রিতে তোমাকে
অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে না পেলেও সিক্ত হয়ে গেছি।
মৃদু পায়ে চলমানা ছায়াময়ী কোমল স্বপ্নের
প্রলেপ প্রার্থনা করি, তাই আরো—আরো ঘুম চাই।
রূঢ়তা ও কর্কশতা তরল সুস্বাদু ক'রে নিয়ে
অবচেতনার গান গেয়ে যাও মিলন বশত।
অজ্ঞতা, দোলায়মান বিমূঢ়তা থেকে নির্দিষ্টতা
স্বপ্ন, তুমি দিতে পারো, বাস্তব আলোক না জেবলেও
সমাজের অগোচরে প্রকৃত আলোকে নিয়ে যাও।
১৯.১২.৬৩.

৩

শুনেছো, স্বপ্নের মাঝে আমাদের অতৃপ্তিরা আসে।
অথচ অধিকতর তত্ত্ব আছে, চিন্তা রয়ে গেছে।
সে সব জটিলতর সমস্যার অনায়াসলীন
সমাধান কোনোদিন চেতনায় না-পেয়ে থেমেছি,
কষ্ট পেয়ে গেছি, তার সমাধান অবচেতনায়
হলে সেই বিষয়ের স্বপ্ন দেখি, সাধপূর্ণ হয়,
বোঝা যায় সমস্যার সমাধান অবচেতনায়
হয়ে গেছে, চেতনায় সঞ্চার সঞ্চার লাভ ক'রে
সব বলে দিয়ে যাবে ; অন্ধকার, বিষয়, সময়
এইভাবে স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, তবুও তোমার
শিল্পময় সব অঙ্গ, অঙ্গাঙ্গী যমক বাস্তবের
মতো স্পষ্ট পেতে হলে বাস্তবের অভিজ্ঞতা চাই
না হলে যথাসময়ে সর্বকিছু অন্তর্হিত হয়,
অদ্ভুত ধোঁয়ার মাঝে মিশে যায় বল্বীপ, দোলন
তাহলেও তৃপ্তি আছে, সর্বশেষ তৃপ্তি পাওয়া যায়।
১৯.১২.৬৩.

৪

বহু সম্ভাব্যতা দেখি, দেখি দুটি আপ্লুত নয়ন
প্রাণে ছায়াপাত ক'রে অতীন্দ্রিয় সারসের মতো
মৃদু পায়ে হেঁটে যাও সম্মুখের সুস্পষ্ট প্রসারে।
উত্তোলন পটিয়সী, মাঝে মাঝে কেয়ারির ধারে
উদ্‌গত চুম্বন হয়ে রোমাঞ্চ বিস্তার ভালোবাসো।

কখনো শ্রবণা ঘিরে, কখনো কৃত্তিকা ঘিরে ঘিরে
পার্থিব বয়সগুলি নিঃশ্বসিত সদা নিঃশ্বসিত—
'যদি কোনোদিন তারা পূর্ণতার অবকাশ দিতো।'
তাদের পশ্চাৎ আছে, প'ড়ে আছে অনেক সম্মুখ।
অথচ মসৃণভাবে সেতু রচনায় সুপ্রয়াসে
বাধা আসে, বাধা আসে, অবিরাম বাধা এসে পড়ে,
যেহেতু পার্শ্বও আছে, সকলের পরিপার্শ্ব আছে।
তবু দেখা যায় কিছু পিছে ফেলে বিজয়িনী হয়
সক্রিয় মহিলাগণ—পরিপার্শ্বে মহিলা নিচয়।
২৯ ১ ৬৪.

৫

বিষণ্ণতা, অতি স্পষ্ট ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে আজ,
পৃথিবীতে স্বাদোত্তীর্ণ জীবন সম্ভবপর নয়।
সম্মুখে তাকালে দেখি স্বাদহীন বর্তনশীলতা—
নিরর্থক, প্রতিরুদ্ধ বর্তনশীলতা প'ড়ে আছে।
পাথরের প্রতি চেয়ে বোঝা যায় তার এ-সকল
ব্যথা নেই, ক্ষোভ নেই, পৃথিবীর পাখিদের শিরে
প্রাপ্ত বোধসমূহের সংশ্লেষণজাত কোনো রূপ
সুকল্পনা কোনোদিন জন্মলাভ করে না, অর্থাৎ
অতৃপ্তির হাহাকার তাদের হৃদয়ে বেশি নেই।
পাথরের পাখিদের থেকে সব মানুষের মন
পরিক্রমা ক'রে তবে আমার হৃদয়ে আসা যায়।
ফলে বুঝি, নেই, নেই, মানবীর মনে নেই এত
দিগন্তময়তা, আলো, পথে নেই হিংসাজাত বাধা,
তাই শুধু আমাদের প্রাণে বাজে আমাদের কথা।
৩১.১.৬৪.

৬

বহুতর আয় আজ মানুষের চতুষ্পার্শ্বময়।
বহুতর আয় যেন জনপ্রিয় রূপে জ'মে গেছে
তবু কী গোপন এক অপব্যয় স্পৃহা অবশেষে
আবিষ্কৃত হয়ে গেলো, অনিঃশেষ, বিনষ্টীকরণ
প্রতি মানুষের মনে, স্বভাবে দূরপনেয়ভাবে
ওতপ্রোতভাবে আছে, জীবনেরই বিনষ্টীকরণ।
আলোকেরও চেয়ে বেশি কালিমায় লুব্ধায়িত লোভে
শিখা যেন প্রজ্জ্বলিত হতে চায়, প্রজ্জ্বলিত হয়।
প্রিয়তমা, এই জ্ঞানে চতুর্দিক উদ্ভাসিত আজ।

বিক্ষোভময়তা ক্রমে পৃথিবীতে ভয়াবহভাবে
বৃদ্ধি ক'রে দিতে হলো, কোনো এক অগ্রগমনের
ভূমিকা স্বরূপ ক'রে, কোনো কালে কিছু স্বচ্ছ হবে
প্রথম প্রণয় চেষ্টা, পারিবারিকতা, তবে আজ
মূক ও বধিরগুলি চ'লে গেলো কেমন নীরবে।
৮.২.৬৪.

'আমার ঈশ্বরীকে' থেকে আরও একটি কবিতা

দেবকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠ-ই অল্প-স্বল্প পরিবর্তন সহ 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অরুণা সংস্করণই এখন বাজারে প্রচলিত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে কবিতার পাঠে বিনয় যথেষ্ট গুরুতর নানা পরিবর্তন করেন এবং নিচের একটি উল্লেখপঞ্জীতে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩৬ সংখ্যক কবিতার যে পরিবর্তন 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠে ঘটেছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করায়, সে বিষয়ে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল।

'গ্রন্থজগৎ সংস্করণে 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩৬ সংখ্যক কবিতার প্রথম পংক্তিটি হল : 'ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে'। কবিতাটি স্পষ্টতই জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা। কিন্তু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, জীবনানন্দ সম্পর্কিত এই অনবদ্য কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র মূল সুরের সঙ্গে মেলে না। 'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত লেখাটি কী ভাবে জায়গা পেল—এই প্রশ্ন নিজেকে আমি বহুবার করেছি। বিনয় মজুমদারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি আমার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। আলোচ্য কবিতাটির 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠটিকেই আমার 'ফিরে এসো, চাকা'র পক্ষে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় কারণ 'ফিরে এসো, চাকা'র মূলসুরের সঙ্গে এটি মিলে যায়। হয়ত-বা 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠটিই এই কবিতার মূলপাঠ, কিন্তু এই বিষয়ে বিনয় মজুমদার কিছু না বলা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। আলোচ্য কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত পাঠে বিনয় মজুমদার দ্রষ্টার মতো তাঁর ও তাঁর কবিতাবলীর ভবিতব্য বর্ণনা করেছেন—

'বৃষ্টির নিমিত্ত ছিলো, এখনো রয়েছে, চিরকাল
রয়ে যাবে ; সঙ্গোপন লিপ্সাময়ী, কম্পিত প্রেমিকা—
তোমার কবিতা, কাব্য ; সংশয়ে সন্দেহে দুলে দুলে
তুমি নিজে ঝ'রে গেছো, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে।
ধূসর, ধূসরতর, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
কতিপয় চিল শুধু বলেছিলো, 'এই জন্মদিন'।

এবং গণনাতীত পারাবত মেঘের স্বরূপ
দর্শনে বিফল ব'লে ভেবেছিলো, অক্ষমের গান।
সংশয়ে সন্দেহে দুলে, একই রূপ বিভিন্ন আলোকে
দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ হয়ে তুমি অবশেষে
একদিন সচেতন হরিতকী ফলের মতন
ঝ'রে গেলে অকস্মাৎ, শুধু ভবিষ্যত হেসে ওঠে।
এখন সকলে বোঝে, মেঘমালা ভিতরে জটিল
পুঞ্জীভূত বাষ্পময়, তবুও দৃশ্যত শান্ত, শ্বেত'

'ফিরে এসো, চাকা'র নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের যে কোনো সচেতন পাঠকের মনেই খুব স্বাভাবিক ভাবে যে প্রশ্নটি উঁকি মারবে সেটি হল 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি পালটে 'আমার ঈশ্বরীকে' করার কারণ কী এবং 'ঈশ্বরীকে' বলতে বিনয় কী বোঝাতে চাইছেন? পাঠকের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে যে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি বিনয় উৎসর্গ করেন তাঁর ঈশ্বরীকেই। —এই প্রসঙ্গে 'ঈশ্বরী' বলতে বিনয় নিজে কী বোঝাতে চাইছেন তা আমরা আগে দেখব।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে এবং ১৯৬৪ খৃস্টাব্দেই বিনয় আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে তাঁর 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের তিন-তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটি বিষয়ে বিনয় আমার নানা প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দিয়েছেন। আমি এখানে বিনয়ের সেই উত্তরের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধার করছি :

"ঈশ্বরীর' বইখানা তোমায় ভাবিয়েছে বুঝতে পারছি। 'ঈশ্বরীর' বইখানা আমি যখন লিখি তখন আমি সত্যিই ভাবতাম যে

১) আমি ঈশ্বরীর স্বামী

২) ঈশ্বরীই বইখানা ব'লে ব'লে দিয়েছে, জানিয়ে দিয়েছে আমার চিন্তাজগতে এবং আমি লিখেছি। 'সেহেতু প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য, কবিতাসহ / ঈশ্বরীর স্বরচিত, আমি তার লিপিকার স্বামী।' —একথাতো বইতে ছাপাই আছে।.....

৩) বইখানার নাম 'ঈশ্বরীর' দেবার দুটো কারণ আছে। একটা কারণ আমি আগেই লিখেছি —'সেহেতু প্রকৃতপক্ষে এইকাব্য, কবিতা সমূহ / ঈশ্বরীর স্বরচিত'

দ্বিতীয় কারণটি গোপনই ছিল এতকাল। তুমি যে পরিস্থিতিতে আমার কাছে জানতে চাইছো সে পরিস্থিতিতে তোমাকে জানিয়ে দেওয়াই ভালো। বই-এর মলাটেই ছাপা

ঈশ্বরীর
বিনয় মজুমদার

এটিকে তুমি একটি বাক্য হিসেবেই গ্রহণ করো। অর্থাৎ ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার। এটা একটা বাক্য। এটা যে বইএর নাম সে কথা আপাতত ভুলে যাও। সাধারণ একটি বাক্য হিসেবেই পড়। নামপত্রেও ছাপা বাক্যটি 'ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার'। অর্থাৎ

বিনয় মজুমদার কার? ঈশ্বরীর। অর্থাৎ আমি তখন এমন আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক অবস্থায় প'ড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীর হাতে সমর্পণ করেছিলাম, বাঁচবার জন্য।" দীর্ঘ এই উদ্ধৃতি একটু মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে বিনয় 'ঈশ্বরী' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন তা যেন আমরা বুঝতে পারি। যেন মনে হয়, 'ঈশ্বর' বলতে সাধারণ ভাবে যা বোঝায়, বিনয় 'ঈশ্বরী' বলতে তেমনই কোনো ধারণাকে বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু এই মনে হওয়াটা ভুল।

'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে বিনয় মজুমদারের একটি প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় প্রচ্ছদপরিচিতিতে লেখা হয়েছে : 'প্রচ্ছদচিত্র : ঈশ্বর-ঈশ্বরীর স্বপ্রতিকৃতি / প্রচ্ছদলিপি : বিনয় মজুমদারের (ঈশ্বর ঈশ্বরীর) হস্তলিপি'।

এই প্রচ্ছদপরিচিতি থেকে এ কথা জানা যাচ্ছে যে বিনয় তাঁর নিজের আঁকা নিজের ছবিকেই ঈশ্বর-ঈশ্বরীর 'স্বপ্রতিকৃতি' হিসেবে ঘোষণা করছেন এবং তাঁর হাতের লেখাকেই তিনি ভাবছেন ঈশ্বর-ঈশ্বরীর হস্তলিপি বলে। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটি পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে বিনয় এই গ্রন্থে নিজেকেই ঈশ্বর ভাবছেন এবং তাঁর অন্বিষ্ট 'ঈশ্বরী'কে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। এই ধরনের ভাবনাচিন্তার তাৎপর্য দার্শনিক বা মনস্তত্ত্ববিদরাই ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নিজেকে ঈশ্বর ভেবে বা 'ঈশ্বরী'কে নিজের মধ্যে কল্পনা করে মহৎ কবিতাও হয়ত রচনা করা যায়। কিন্তু 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থের কবিতার পর কবিতায় দেখি বিনয় তাঁর নিজেরই মধ্যে কল্পিত ঈশ্বরীর সঙ্গে তাঁর মানস-সঙ্গমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন : 'চিন্তার সঙ্কট এলে এইরূপ কথা ভাবা, দৃশ্য ভাবা নিরাপদ, ভালো / তবেই আদর ক'রে ভালোবাসে সময়, আকাশ আগ্নি, নক্ষত্রের আলো।' ('আমি আর করবী কুসুম' কবিতা, 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)। দেখা যাচ্ছে, বিনয় তাঁর চিন্তায় সঙ্কট আসার কথা স্বীকার করছেন এবং এই সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে কল্পিত ঈশ্বরীর সঙ্গে মানস-সঙ্গমে রত হয়েছেন।

'ফিরে এসো, চাকা'য় অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবির কোনো চিহ্নই 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যৌন সঙ্গমের এবং শুধুমাত্র যৌন সঙ্গমেরই অনর্গল বর্ণনা থাকার ফলে 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থটি একটি অশ্লীল এবং অপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি পড়লে যে কোনো সহৃদয় পাঠকেরই মনে হবে, বিনয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বিনয় মজুমদারের তরুণ বয়সের পাতাজোড়া ভারি সুন্দর একটি ফটোগ্রাফ আছে। এই ফটোগ্রাফের পিছনে কয়েকটি টেলিফোন রিসিট্-এর ফটোকপির নিচে লেখা আছে : 'Receipt of telephone calls I made to converse with my goddess-wife.' বুঝতে বাকি থাকে না মানসিক বিপর্যয়ের কোন পর্যায়ে বিনয় এই সময়ে ছিলেন। আমার নিজের ধারণা, বিনয় মজুমদারের

এই মানসিক বিপর্যয়ের কারণ অংশত 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতার মধ্যেই নিহিত। এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যে বিনয় যে দার্শনিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করলেই 'ঈশ্বরী' বলতে বিনয় কী বোঝাতে চাইছেন তা জানা যাবে।

'ফিরে এসো, চাকা' বাহ্যত 'প্রেমার্তির কাব্য', কিন্তু একটু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায়, বিনয় তাঁর ঈশ্বর-জিজ্ঞাসাকেও এই কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন :

'মানুষ কাউকে চায়, তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোন সাধনার ফল।'

(সুরঞ্জনা / বনলতা সেন)

জীবনানন্দ ঈশ্বরকে 'নিহত' হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে ঈশ্বর বিষয়ে কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসা বা অন্বেষণ নেই। ক্ষুরধার, বিপদজনক এবং প্রায়শই বিধ্বংসী এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চরম নাস্তিবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং এই জিজ্ঞাসার আগুনেই বিনয় মজুমদারকে প্রায় সম্পূর্ণই পুড়িয়ে দিয়েছে।

বিনয়ের আধুনিক মন সনাতন ঈশ্বরের ধারণায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি, অথচ ঈশ্বরের অনস্তিত্বকে তিনি নাস্তিকের মতো মেনেও নিতে পারেননি খোলা মনে। চিন্তা ও চেতনায় তিনি নাস্তিক, অথচ নিজের জীবনে তিনি আস্তিকের স্বস্তি ও শান্তি কামনা করছেন। তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্বে কবি আশ্রয়হীন, গতিহীন, একা। 'ফিরে এসো, চাকা'য় কবি এই জীবনের মূল অবলম্বনের মতো গতিরই (অর্থাৎ ঈশ্বরেরই) অন্বেষণ করছেন, যদিও একথা তাঁর জানা যে, যে লুপ্ত গতি উদ্ধারের জন্য তাঁর এত হাহাকার, আকুলতা—তা তিনি কোনোদিনই লাভ করতে পারবেন না। 'ফিরে এসো, চাকা'র চাকা আসলে গতির প্রতীক, লুপ্ত ঈশ্বর-বোধের প্রতীক। নাস্তিক হয়েও জীবনে আস্তিকের স্বস্তি ও শান্তি কামনা করে বিনয় আসলে সচেতন ভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছেন। সচেতন ভাবে ভুলে থাকার প্রয়াস—এই 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থ—কবিতার জগতে সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে।

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থে কোনো এক সুদূর নিষ্ঠুর, 'শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীলা'র বিরহে কবি কাতর। সুদীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে তিনি ক্লান্ত, তাঁর দু-পায়ে রক্ত, তবু বিস্মরণশীলার দেখা নেই। 'ফিরে এসো চাকা'র বহু কবিতাতেই এই বিস্মরণশীলা'র শারীরিক অস্তিত্ব প্রকট। আবার অনেক কবিতাতেই এই 'বিস্মরণশীলা'কে ঈশ্বরীর প্রতীক হিসেবে চিনতে কষ্ট হয় না :

'অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতায়
সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে, বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।

বালুময় বেলাভূমি চিহ্নিত করার পরেকার
তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি মনোলীনা।...
বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ নড়ে—এই দৃশ্য দেখেই কখনো
সে নিজে দোলনক্ষম—এই কথা পাখীদের মতো
ভুল করে ভেবেছো কি, তোমার বাতাসে সে তো দোলে।'

আকাশের বর্ণহীনতার সংবাদের মতো কবি যাকে জেনেছেন, 'বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ' যার বাতাসে নড়ে, সে তো রক্তমাংসের কেউ হতে পারে না! কিন্তু এই ধরনের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই কবির এমনও মনে হয় :

'দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়তো লুপ্ত মৃত।'

যাকে 'কাল্পনিক ব'লে মনে হয়' অস্তিত্বহীনা, লুপ্ত অথবা মৃত মনে হয় তাকে খুঁজে পেতে চাইলে তো মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেবেই। নিজের এই ব্যাকুল অন্বেষণের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার বিষয়েও কবি পূর্ণমাত্রায় সচেতন, কারণ তিনি বলছেন :

'করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ ফোটেনি
এই শোকে ক্ষিপ্ত আমি, নাকি ভ্রান্তি হয়েছে কোথাও?'

করবী তরুতে গোলাপ ফুটবে কী করে? এই অন্বেষণের জন্য কবির মনে সুতীব্র এক মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। সীমাহীন অবিশ্বাস নিয়ে তিনি সুদূর, নিষ্ঠুর, অলীক এক মানস-প্রেমিকার প্রেমে মগ্ন হয়ে নিজস্ব এক মানসিক শান্তি খুঁজে ছিলেন। মানস-প্রেমিকার জন্য এই হাহাকার ও অন্বেষণ অংশত ঈশ্বরের জন্য বিনয়ের হাহাকার ও অন্বেষণের প্রতীক। বিনয়ের প্রজ্ঞাই তাঁকে জানিয়েছিল—তাঁর এই অন্বেষণের ফল শূন্য। তীব্র অনুভূতিশীল বিনয় সম্ভবত এই নিষ্ফল অন্বেষণের ফলেই তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিশ্বে তাঁর ঈশ্বরীকে খুঁজে না পেয়ে বিনয় শেষ পর্যন্ত নিজেকেই একই সঙ্গে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বলে ঘোষণা করেন' ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থে। এবার প্রশ্ন হল : তিনি নিজেই যদি ঈশ্বর হন এবং ঈশ্বরী যদি তাঁর ভিতরেই অবস্থান করেন তাহলে 'ফিরে এসো, চাকা'র ব্যাকুল ও হাহাকারময় অন্বেষণের অর্থ কী? বোঝা যায়, নিজের বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতেই বিনয়ের এই জোড়াতালি। বিনয় তাঁর 'বিস্মরণশীলা'কে 'ফিরে এসো, চাকা'য় যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। যে নেই যেন তারই জন্য 'ফিরে এসো, চাকা'য় অন্বেষণ করা হয়েছে, অপেক্ষা করা হয়েছে। এ যেন 'করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ' ফুটবে বলে অপেক্ষা করা। ঈশ্বরীকে অর্থাৎ 'বিস্মরণশীলা'কে নিজের মধ্যেই কল্পনা করে নিয়ে বিনয় তাঁর অযৌক্তিক অন্বেষণকে যুক্তিসিদ্ধ করতে চেয়েছেন। 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলী যেন তাঁর নিজের মধ্যকার ঈশ্বরীকেই নিবেদিত। তাই 'ফিরে এসো, চাকা'র নামটি পরিবর্তন করে বিনয় করেন 'আমার ঈশ্বরীকে'। 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি পালটে কেন 'আমার

ঈশ্বরীকে' করা হয়েছিল এবং কেনই বা আবার 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে 'ফিরে এসো, চাকা' করা হয় ? আমার এ প্রশ্নের জবাবে বিনয় আমাকে লিখেছেন : "'ফিরে এসো, চাকা'র নামটি পালটে কেন আমি 'আমার ঈশ্বরীকে' করেছিলাম তার কারণ সোজা। তখন আমি আর্থিক, সামাজিক রাজনৈতিক এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। ধরো ঈশ্বরী স্বয়ং আমার নাম পালটে মূল নাম 'ফিরে এসো' চাকা' করেছেন।"

ফিরে এসো, চাকা : কলকাতা সংস্করণ

'আমার ঈশ্বরীকে'র পরে 'ফিরো এসো, চাকা'র কলকাতা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করেন মীনাক্ষী দত্ত, ৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৯ থেকে। প্রকাশের তারিখ : ১লা মার্চ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দ ; দাম : তিন টাকা। কলকাতা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠে গ্রন্থজগৎ সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

'ফিরে এসো, চাকা'র কলকাতা সংস্করণ প্রকাশের সময়, জ্যোতির্ময় দত্ত বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন রচনা ও প্রকাশ করেন। কোনো কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এত ভালো বিজ্ঞাপন বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন রচিত হয়নি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই বিজ্ঞাপনটির কথা সোনার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত। নিচে এই বিজ্ঞাপনটি হুবহু পুনর্মুদ্রিত করা হল। বিজ্ঞাপনটির শেষ পংক্তিতে লেখা হয়েছে : 'অম্লানের অনুভূতিমালা যন্ত্রস্থ'। 'অম্লানের অনুভূতিমালা' কিন্তু কলকাতা সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি, এটির প্রকাশক : অরুণা বাগচী, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগল কিশোর দাশ লেন, কলকাতা-৬, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮১ বঙ্গাব্দের, শ্রাবণ মাসে।

'বিনয় মজুমদার

.....

ফিরে এসো, চাকা

এই কবিতাগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়
সাত বছর আগে। বিশাল পাঠকসমাজ যদিও
এটির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না, বাংলা কবিতার সবচেয়ে
অগ্রসর পাঠক ও ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষক মহলে 'ফিরো এসো, চাকা'
এই কয় বছরে একটি গুপ্ত ক্লাসিকের স্থান ক'রে নিয়েছিলো। অবশ্য
এমনকি এই সব মহলেও এর খ্যাতির ভিত্তি ছিলো প্রধানত কল্পনা,
জনশ্রুতি ও কবির জীবন-বিষয়ে কিংবদন্তি, বইটির প্রথম সংস্করণ খুঁটিয়ে
পড়া তো দূরের কথা, এমনকি হাতে ধরার, এমনকি চোখে দেখার
সৌভাগ্যও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র রসিক, অন্তরঙ্গ, অধ্যবসায়ী ও
অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হয়েছে। ফলে, 'ফিরো এসো চাকা'
গ্রন্থে কেবল এক সংকীর্ণ গোষ্ঠীর ছিলো অধিকার।

বর্তমান কলকাতা-সংস্করণ এই গুপ্ত, ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থটিকে সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করেছে। এবং এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'ফিরে এসো, চাকা' কেবল কোনো ক্ষুদ্র, ভূগর্ভস্থ গোষ্ঠীর গোপন সম্পদ নয়, তা বাংলা কবিতার প্রধান ধারারই এক অর্ধচক্রাকার বাঁক। 'ফিরে এসো, চাকা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কি 'অর্কেস্ট্রা'-র তুল্য গ্রন্থ। এবং এর কবি কেবল জীবিত নন, তিনি বাংলা কবিতার অমরদের একজন।

কলকাতা-সংস্করণে

বিনয় মজুমদার-এর কবিতা গ্রন্থ

*

ফিরে এসো, চাকা তিন টাকা

অম্লানের অনুভূতিমালা যন্ত্রস্থ'

ফিরে এসো চাকা : অরুণা সংস্করণ

কলকাতা সংস্করণের পর প্রকাশিত হয় 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণ। প্রথম অরুণা সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হল :

'প্রথম অরুণা সংস্করণ / অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ / প্রকাশিকা / অরুণা বাগচী / ৭ যুগল কিশোর দাস লেন / কলকাতা-৬ / প্রচ্ছদপট / পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় / মুদ্রক / দুর্গাপদ ঘোষ / শ্রীঅরবিন্দ প্রেস / ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট্ / কলকাতা-৬ / © বিনয় মজুমদার' জুলাই ১৯৯০ খৃস্টাব্দে 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম অরুণা সংস্করণে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ছিল। গুরুতর একটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছিল ৭৩ নম্বর কবিতার প্রথম লাইনে। 'যাক, তবে জ্ব'লে যাক, জলন্তম্ভ ছেঁড়া ঘা হৃদয়' লাইনের 'ছেঁড়া ঘা' এর জায়গায় ছাপা হয়েছিল 'ছেঁড়া যা'। অরুণা সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণে প্রথম সংস্করণের ভুলগুলি শুধরে দেওয়া হয়নি, তাছাড়া নতুন মুদ্রণ প্রমাদও কিছু ঘটেছে ; সবথেকে উল্লেখযোগ্যটি হল : ২১ নম্বর কবিতার 'বিকাশের রীতিনীতি এই।' অংশটি হয়েছে 'বিকাশের রাজনীতি এই।'

ঈশ্বরীর কবিতাবলী

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' বিনয় মজুমদারের স্বতন্ত্র কোনো কাব্যগ্রন্থের নাম নয়। এই গ্রন্থে বিনয় তাঁর ইতিপূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে বিভিন্ন কবিতা সংকলিত করেছেন, তাছাড়া পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অধিকন্তু'র ১০টি কবিতাও এই গ্রন্থে আছে। নিচে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা উদ্ধৃত করা হল :

''ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র কপিরাইট ধারক : বিনয় মজুমদার / প্রথম প্রকাশের তারিখ : ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ / ৩১শে জুলাই, ১৯৬৫ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু / ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট্ / কলকাতা-১২ / মুদ্রক : নির্মল কৃষ্ণ পাল। নির্মল মুদ্রণ / ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট / কলকাতা-৬ / মূল্য ২.০০ টাকা।'

'ঈশ্বরীয় কবিতাবলী' ছাপা হয়েছে খুব সাধারণ ব্রাউন পেপারে, বই বিক্রির সময় বই বিক্রেতারা সাধারণত এই কাগজেই বই মুড়ে দেন।
এই গ্রন্থে 'আমার ঈশ্বরীকে' এবং 'ঈশ্বরীর' তৃতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া, এই গ্রন্থে 'নক্ষত্রের আলোয়' থেকে ৭টি এবং 'অধিকন্তু'র প্রথম ১০টি কবিতা গৃহীত হয়েছে। 'অধিকন্তু' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খৃস্টাব্দের, ১৭ই সেপ্টেম্বর।
'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলিকে পংক্তিতে বিন্যস্ত করে মুদ্রিত করা হয়নি, মুদ্রিত করা হয়েছে গদ্যের মতো সম্পূর্ণ লাইন জুড়ে। দুটি লাইনের ভিতর পার্থক্য বোঝাবার জন্য '/' —এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে।
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে গৃহীত 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠে বিনয় কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন।

'ফিরে এসো, চাকা' : বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ সংক্রান্ত একটি উল্লেখপঞ্জী :

'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণে নানা কবিতায় বিনয় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিনয় আমাকে জানিয়েছেন, 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রকৃত পাঠ। নিচের উল্লেখ-পঞ্জীটিতে 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল। উল্লেখপঞ্জীতে শুধুমাত্র পরিবর্তিত / বর্জিত পংক্তি / পংক্তিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক।—
'ফিরে এসো, চাকা'র ১৬ নম্বর কবিতাটির বিষয়ে উল্লেখপঞ্জীতে লেখা হয়েছে : "১৬ নম্বর কবিতার 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই। এই কবিতার শেষ লাইন : যেন কোনো নিরুদ্দেশে, কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে। [আ. ঈ ও ঈ. ক.]" এখানে বুঝতে হবে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৬ নম্বর কবিতায় 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি 'আমার ঈশ্বরীকে' ও 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে বর্জন করা হয়েছে এবং শেষ লাইন, 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে ইটের মতোন ফেলে রেখে' 'আমার ঈশ্বরীকে' ও 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে পরিবর্তিত হয়েছে ; 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে।' কবিতার বাকি অংশ সর্বত্রই এক।
এই উল্লেখপঞ্জীটিকে ব্যবহার করতে গেলে অরুণা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাগুলিকে ১, ২, ৩, ৪···এইভাবে সংখ্যায়িত করে নিতে হবে। অরুণা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা' বাজারে প্রচলিত হওয়ায় এই সংস্করণের পাঠটিকেই মূল পাঠ ধরে নিয়ে উল্লেখপঞ্জীটি প্রস্তুত করা হয়েছে। 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের যে সব পরিবর্তন 'ফিরে এসো, চাকা'য় করা হয়েছিল সেগুলির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

পরিবর্তিত/বর্জিত পংক্তি/পংক্তিগুলির উল্লেখপঞ্জী

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্তকগুলি উল্লেখপঞ্জীতে ব্যবহার করা হয়েছে : গ্র. স. = গ্রন্থজগৎ সংস্করণ আ. ই. = আমার ঈশ্বরীকে, ঈ. ক. = ঈশ্বরীর কবিতাবলী, ক. স. = কলকাতা সংস্করণ।

কবিতার স্তবকবিন্যাসের ক্ষেত্রে 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবে, এই পার্থক্যগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ছাপার ভুলকে সর্বত্রই অগ্রাহ্য করার চেষ্টা হয়েছে।

৩ নং কবিতার শেষ লাইন : 'অতি অল্প রমণীতে ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৮ নং কবিতার ৪ নং লাইন : 'প্রেমিক-প্রেমিকা চায় এই সাধনায় লিপ্ত হতে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.] এবং ১২ নং লাইন : 'ক্রমে ক্রমে মুক্তো হয়ে…' [গ্র. স. ও ক. স].

১৬ নং কবিতার 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই। এই কবিতার শেষ লাইন : 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে' [আ. ঈ. ও ঈ ক.]

১৮ নং কবিতার ১১ নং লাইন : '… অবশেষে দেখি সুখ নয়…' [ঐ. ঐ.]

১৯ নং কবিতার তৃতীয় লাইন : 'ধূমকেতু প্রকৃতই অগ্নিময়…' [গ্র. স. ও ক. স.]

২১ নং কবিতার ৯ নং লাইন : 'এখন জেনেছি বহু…' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

২২ নং কবিতার ৭ নং লাইন : 'সকল জীবন, ফুল, সব কীর্তি, প্রীত কীর্তিগুলি / ধ্বংস হয়ে যেতে পারে…' [ঐ. ঐ.]

২৩ নং কবিতার ৫ নং লাইন : 'ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের লম্ফে শূন্যে দিক পরিবর্তনের' [ঐ. ঐ.] এবং শেষ লাইন : 'কিছুটা সময় দিলে তবে প্রাণে সব ভেসে ওঠে' [ঐ. ঐ.]

২৪ নং কবিতার ৫-৬ লাইন : 'যদিও সংবাদ পাও জ্যোতির মাধ্যমে প্রতিদিন, / জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে এতেই সান্ত্বনা।' [ঈ. ক.]

'যদিও সংবাদ পাবে, পেয়েছো বেতারে প্রতিদিন, / জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে, এতেই সান্ত্বনা।' [আ. ঈ.]

'জ্যোতির মাধ্যমে' স্পষ্টতই জ্যোতির্ময় দত্তকে ইঙ্গিত করছে।

২৫ নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'তোমার প্রসঙ্গে আসি, অতীতের কীর্তি সহায়ক' [ঈ. ক.]

২৬ নং কবিতার প্রথম চার লাইন :

'তিন পা পিছনে হেঁটে উন্মোচিত হয়ে ফিরে আমি।
আবার তোমার কথা মনে আসে, জ্যোতিষ্ক বহ্নল
আকাশেই এসে দ্রুত চ'লে যাওয়া ধূমকেতু যেন
সর্বদা স্মরণে আসো, প্রেয়সী, পূর্ণাঙ্গ জীবনের' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৭ নং লাইন : 'উন্মোচিত হয়ে ফিরি, অজ্ঞাত পূর্ণাঙ্গ জীবনের' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

২৭ নং কবিতায় ৯ নং লাইন : 'অদশ'নে ম'রে গেছে, বর্তমানে কিছু আলোকিত' [ঐ ঐ.]

এই কবিতার 'বেদনার্ত নোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো' লাইনটি অ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে বর্জন করা হয়েছে।

১০ নং লাইন : 'জীবনে ব্যর্থতা থাকে, অসম্পূর্ণ মেঘমালা থাকে' [গ্র. স. ও ক. স.]

২৮ নং কবিতার প্রথম লাইন দুটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই।

৩০ নং কবিতার ৬ নং লাইন : 'ভাবী ইলোরার চিত্র, হরিণের মাংসের মতোন' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.] এবং শেষ দুটি লাইন : 'তবে গুহাচিত্র হতে তোমার সম্মতি আছে ব'লে মনে হয়, তুমি—নারী, নিঃসন্দেহে দীর্ঘায়ু, সফল।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৩১ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'বিরাহত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন' [ঐ. ঐ.]

চতুর্থ লাইন : 'এত উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন সুরুচি' [ঈ. ক.] 'এত উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন শঠতা' [গ্র. স. ও ক. স.]

৩৩ নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'দেহের উপর শীতল ভ্রমের চলা বুঝে' এবং চতুর্থ লাইন : 'হে ভ্রম, বোঝোনি তুমি, দেহ কি না, কার দেহ, প্রাণ' [ঈ. ক.]

৩৪ নং কবিতার ৯-১০ লাইন : 'যে গেছে সে চ'লে গেছে, অবশেষে কাঠটুকু জ্বলে। আপন অন্তরলোকে···' [ঈ. ক.] 'দেশলাইয়ে বিস্ফোরণ হয়ে বারুদ ফুরায় যেন' অংশটি ঈ. ক.-তে নেই।

৩৬ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'ধূসর, ধূসরতর, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে,' অষ্টম লাইন : 'ঝ'রে গেলে অকস্মাৎ, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে' এবং শেষ লাইন : 'তুমি নিজে ঝ'রে গেছো, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক] এই কবিতাটি নিয়ে একটু আগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩৮ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই

৪১ নং কবিতার অষ্টম লাইন : পোড়া ইঁট, ভগ্নপ্রায় পুতুলের অবয়ব, বুক [গ্র. স. ও ক. স.]

৪২ নং কবিতার চতুর্থ লাইন : আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের প্রসারে [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

এই কবিতার ৫-৬ লাইন :

'পুনরায় বিলম্বিত, এতকাল কুসুম কলিকে
ফোটাতে অক্ষম হয়ে শেষে দেখি কাগজে রচিত।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

অষ্টম লাইন : 'খুঁজেছি সংগত হৃদ, দেশে দেশে, হায় অনাহত' [গ্র. স. ও ক. স.]

৪৬ নং কবিতার পঞ্চম লাইন : 'বিধ্বস্ত সময়ে, তবে আমারো তো পদদ্বয় আছে' এবং সপ্তম লাইন : 'নিজের সশস্ত্র শোভা, উলঙ্গ অবস্থা নিয়ে আর' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৪৭ নং কবিতার শেষ লাইন : 'প্রেমিকা ও প্রেমিকের অভীপ্সার রোমাঞ্চ জানে কি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]। 'লতারা কীভাবে বোঝে কাছে কোনো মহীরুহ আছে' লাইনটি

আ. ঈ.-তে নেই, সম্ভবত ভ্রমবশত বাদ গেছে।

৪৮ নং কবিতার 'উৎপাটিত রুগ্ন বৃক্ষ আর কোনো গান গায় না যে / শিকড়ের থেকে তবু নতুন অঙ্কুর অভ্যুদিত'—এই অংশটি এবং 'আমি বৃক্ষ, রোগশয্যা-পরিত্যক্ত টিপয়ের মতো / জীর্ণ ধূলিময় ম্লান। সলিল সমৃদ্ধ সিন্ধু নয়'—এই অংশটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে বর্জিত হয়েছে। এই কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'এমন আগ্রহ হীন, চ'লে গেছো পার্কের আশ্রয়ে' [গ্র. স. ও ক. স.]

৪৯ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'একটি বৎসর শুধু লাস্যময়ী অগ্নির সহিত', এবং ৬-৭ লাইন :

'মথিত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখি কবেকার অসুস্থতা
পৃথিবী ঘিরেছে দ্যাখো, উদ্ঘাটিত করেছি নিঃস্বতা' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

'রোগের সময়ে কোনো শুশ্রূষা পাবার বিত্ত নেই' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে বর্জিত হয়েছে।

৫০ নং কবিতার ষষ্ঠ লাইন : 'মনে নেই গোধূলিতে, সুসংগতি অবশিষ্ট নেই' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫১ নং কবিতার অষ্টম লাইন : হৃদয় বেড়ায় বহু ভবনে উদ্যানে নানা ক্ষণে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]। এই কবিতার শেষ তিনটি লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই। অর্থাৎ কবিতাটি পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটিতে অষ্টম লাইনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

৫২ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'অতি সফলতা নয়, আকাশের কৃপাপ্রার্থী আমি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]। চতুর্থ লাইন : নিমন্ত্রণ পত্র পাই প্রেরকের ঠিকানাবিহীন [ক. স.]

৫৩ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'প্রচেষ্টার সীমা আছে, নিরাশ্রয় রক্তাপ্লুত হাতে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]।

ষষ্ঠ লাইন : 'পৃথিবী নিয়ম বশে নির্বিকার, ধূসরতাবৃত' [ক. স.]

৫৪ নং কবিতার ৫-৬ লাইন :

'ঝরে কিছু, ঝরে স্মৃতি, রহস্য নিলীনা অপসৃতা,
আলিঙ্গন থেকে দূরে, আরো দূরে অবরুদ্ধ নীড়ে।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫৫ নং কবিতার শেষ লাইন : 'নিজের সত্বিকে পেতে, পৃথিবীর কথা সে ভাবে না' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫৬ নং কবিতার ১২ নং লাইন : 'হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ, রক্তাক্ত দু পায়ে…'[ক. স.]

৫৭ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, মিলনাঙ্ক নেই' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫৮ নং কবিতার ষষ্ঠ লাইন : 'টীকা ও টিপ্পনীমাত্র, পরিচয় গভীর তোমার' [ঐ. ঐ.]

৫৯ নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'কেবলই বালুকা ওড়ে, গর্বোন্নত পিপাসা বাড়ায়' [ঐ. ঐ.] এবং পঞ্চম লাইন : 'শুনেছি সভার মাঝে একটি কুসুম ঘ্রাণময়' [গ্র. স. ও ক. স.]

৬১ নং কবিতার শেষ লাইন : 'উৎসুক হবে না কেউ চিন্তনীয় দেবতার শবে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.] এবং ষষ্ঠ লাইন : 'তার দুষ্ট ব্যবহারে, মুহুর্মুহু কাদা, ইতিহাস' [ক. স.]

৬২ নং কবিতার ১-২ লাইন :

'সুস্মিতা গুলিটি মনে বিদ্ধ হয়ে বহুকাল ছিলো
সনাতন মূল কেটে, গবেষণা ক'রে সুস্থ হই।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৬৬ নং কবিতার ৫-৬ লাইন :

'বিকৃত করেছে ; হায়, পিপীলিকা শ্রেণীতে দুজনে / ব্যথার মতোন হয়ে অনেক হেঁটেছি অন্ধকারে।' [ঐ. ঐ] এই কবিতার 'আর আমি বারংবার অসফল, ক্ষমতাবিহীন' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই।

এই কবিতার ১২ নং লাইন : 'সঙ্গিনীর অভ্যন্তরে ক্ষুধার মতোন সংগোপন' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৬৭ নং কবিতার ৩-৪ লাইন :

'জ্যোৎস্নায় অনুনয়, হায় এই মিলন সন্ধান।
আবৃত দূরত্বময়ী নীহারিকা, ক্লিষ্ট গ্রহগুলি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক]

এই কবিতার ৭, ৮ এবং ৯ নং লাইনগুলি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।

৬৯ নং কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই। এই কবিতার ৪-৫ লাইন :

'সে শান্তি অমেয় তৃপ্তি আমাদের হৃদয়ে প্রেমের
মূলে আছে, আছে ফলে, মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

—অর্থাৎ এই কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে শুরু হচ্ছে এভাবে :

'তোমাদের কাছে আছে সংগোপন, আশ্চর্য রত্নদীপ।
সে শান্তি, অমেয় তৃপ্তি আমাদের হৃদয় প্রেমের
মূলে আছে, আছে ফলে, মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ…'

৭০ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'আমার আশ্চর্য ফুল যেন সুকিশোরী, নিমেষেই'
[আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

এই কবিতার ৯-১৩ লাইন :

'আমি চিরমুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে-আশ্রয়ে।
কেন যেন দূরে আছো, ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফুল
হাসি হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো অবয়বহীন' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৭১ নং কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই। ঐ দুটি গ্রন্থে কবিতাটি আরম্ভ হচ্ছে : 'ভালোবাসি পূর্বাহ্নেই রূপে, ঘ্রাণে রসাপ্লুত হতে। / হয়েছি তো কোনো কালে একবার হীরকের চোখে…'

সপ্তম লাইন : 'উদ্বৃত্ত এদের প্রতি তাকাবো উদ্যত বাসনায়' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৭২ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।
৭৩ নং কবিতার পঞ্চম লাইন : 'সুমিষ্ট আহ্বান, ছায়া মেঘ, ঝঞ্ঝা, সোনালি বিদ্যুৎ' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৭৪ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।
৭৫ নং কবিতার ১-২ লাইন :
'কবিতা বুঝেছি আমি, অন্ধকারে একটি আশ্রয়
অলৌকিক আলো দেয়, নিরুত্তাপ কোমল আলোক' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৭ নং লাইন :
'করবী কুসুমও বলে, লম্বিত গভীর হয়ে গেলে' [ঈ. ক.]
১২ নং লাইন :
'শুয়ে শুয়ে আকাশের অনন্তের সায় পেতে পারি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক]
৭৬ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।
৭৭ নং কবিতার প্রথম দুটি লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে বর্জিত হয়েছে। এই কবিতার ৩-৪ লাইন :
'আড়ালে থেকো না, আমি এতদিনে চিনেছি কেবল
অপার ক্ষমতাময়ী হাতখানি, ক্ষিপ্র হাতখানি' [ঈ. ক.]
শেষ লাইন :
'আড়ালো থেকো না আর একা ঘুমোবার সাধ নিয়ে' [ঈ. ক.]
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৭৭ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে শুরু হচ্ছে 'আড়ালে থেকো না আমি, এতদিনে চিনেছি কেবল'—এই লাইনটি দিয়ে।

উল্লেখপঞ্জীটি পড়লে খুব সহজেই বোঝা যাবে যে 'ফিরে এসো, চাকা'র বর্তমান অরুণা সংস্করণের সঙ্গে গ্রন্থজগৎ সংস্করণ বা কলকাতা সংস্করণের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত সংস্করণে বা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে গৃহীত 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠে যে সব পরিবর্তনগুলি ঘটানো হয়েছিল তা যথেষ্ট গুরুতর। এই পরিবর্তনগুলি ঘটিয়ে বিনয় মজুমদার 'ফিরো এসো, চাকা'র রহস্যময়তাকে খুন করেছিলেন, বড়ো বেশি প্রকাশে এনে ফেলেছিলেন কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত গোপনীয়তাকে। বলাই বাহুল্য, এই পরিবর্তনগুলির অধিকাংশই প্রীতিপদ হয়নি। খুব সংগত কারণেই বিনয় পরবর্তীকালে এই পরিবর্তনগুলিকে বাতিল করেন এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র কলকাতা বা অরুণা সংস্করণে আবার গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠ ফিরে আসে। মনে প্রশ্ন জাগে : কেন বিনয় মজুমদার 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে এই পরিবর্তনগুলি ঘটিয়েছিলেন? এর উত্তরে বলা যায় এই পরিবর্তনগুলি করার সময় অর্থাৎ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে বিনয় গভীর ও জটিল এক মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েন যার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ 'ফিরে এসো,

চাকা'র কবিতায় এই পরিবর্তনগুলি ঘটে যায়। একটু আগে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের শেষে বিনয় মজুমদারের কবি-প্রতিভার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়টির কথা উল্লেখ করি। বিনয় 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩১-সংখ্যক কবিতায় ('প্রত্যাঘাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন') নিজেকে আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিনয়ের কবি প্রতিভার চরিত্রও আগ্নেয়গিরির মতন। আগ্নেয়গিরির মতোই বিনয়ের কবি প্রতিভা অধিকাংশ সময়েই নিদ্রিত থাকে, জেগে ওঠে কদাচিৎ ; কিন্তু এই জাগরণ বিস্ময়করভাবে সৃষ্টিশীল। 'নক্ষত্রের আলোয়' রচনাকালীন প্রস্তুতিপর্বের কথা বাদ দিলে ১৯৬০ থেকে ১৯৯২—এই সময় সীমার মধ্যে বিনয়ের কবি-প্রতিভা জেগে উঠেছে মাত্রই দু-বার, তাও খুব অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু বিনয়ের কবি-প্রতিভার এই দুটি ক্ষণস্থায়ী জাগরণই বাংলা ভাষাকে উপহার দিয়েছে দু-দুটি মহামূল্যবান কাব্যগ্রন্থ। প্রথমবারের জেগে ওঠাটি কিছু কম, ২৮ মাস স্থায়ী এবং এই সময়ের উদ্গিরণ 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলী। দ্বিতীয় ও শেষ বারের জন্য বিনয়ের কবি-প্রতিভা মাত্র একমাসের জন্য জেগে ওঠে এবং তার ফলে আমরা পেয়েছি 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'। 'নক্ষত্রের আলোয়' 'ফিরে এসো, চাকা' এবং 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের কথা বাদ দিলে বিনয়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি প্রতিভার স্পর্শহীন এবং নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। 'ফিরে এসো, চাকা' ও 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র মধ্যবর্তী সময়ে বিনয় প্রকাশ করেন 'ঈশ্বরীর' (১৯৬৪) এবং 'অধিকন্তু' (১৯৬৭)। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র পরে প্রকাশিত হয় 'বাল্মীকির কবিতা' (১৯৭৬), 'আমাদের বাগানে' (১৯৮৫), 'আমি এই সভায়' (১৯৮৫) এবং 'এক পংক্তির কবিতা' (১৯৮৮)। দু-একটি স্মরণযোগ্য পংক্তি বা দু-একটি পাঠযোগ্য কবিতা এই কাব্যগ্রন্থগুলির ভিতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও—এ কাব্যগ্রন্থগুলি ব্যর্থ কবিতা এবং অকবিতায় ভরে আছে। মহৎ প্রতিভার এ-এক আশ্চর্য চরিত্র !

'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে আলোচনা শেষ হল। যেহেতু এই প্রবন্ধের বেশির ভাগটাই তথ্য-কণ্টকিত, সেহেতু এই আলোচনা রসকষহীন হয়ে পড়েছে। একই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে আলোচনা করার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনরুক্তিকেও এড়ানো যায়নি। বলাই বাহুল্য, এগুলো ঘটেছে আমারই অক্ষমতার জন্য। তবু আমার এই আলোচনায় 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণ বিষয়ে পাঠকদের কৌতূহলকে যদি সামান্য পরিমাণেও নিবৃত্ত করতে পেরে থাকি তো নিজেকে ধন্য মনে করব। □